কল্পবিজ্ঞানের গল্প

সম্পাদনা
- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সুধীন্দ্র সরকার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূ-চি-প-ত্র

গল্প	লেখক/লেখিকা	পাতা
রহস্য	হেমলাল দত্ত	১৩
পলাতক তুফান	জগদীশচন্দ্র বসু	২২
হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী	সুকুমার রায়	২৭
মৌকাসাবিস একবচন না বহুবচন	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩৩
টমির সন্ধানে	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৪
মায়া	লীলা মজুমদার	৫১
হেলমেট	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	৫৭
যখের ধন ধরতে গেলে মিলিয়ে যায়	বৃন্দাবন বাগচী	৬৩
প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত	সত্যজিৎ রায়	৬৮
নীল বামন	বিমল কর	৭৭
অঙ্কের ভুল	অরুণ বাগচী	৮৪
ফন্দি	সমরজিৎ কর	৯১
বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মঙ্গল অভিযান	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	৯৯
চোখ	অদ্রীশ বর্ধন	১০৬
ফর্মূলা ভি-পি ২১০০	সলিল লাহিড়ী	১১৮
দুটি মানুষ ও একটি কালো বাক্স	সুকুমার ভট্টাচার্য	১২৬
ম্যাজিশিয়ান বিশ্বমামা	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৪
অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৩৯

গল্প	লেখক/লেখিকা	পাতা
সাত্যকি সোম ও মহাকালাধার	রেবন্ত গোস্বামী	১৪৪
আজব দেশে নিকুঞ্জবিহারী	পার্থসারথি চক্রবর্তী	১৫০
পাড়ি	অমিত চক্রবর্তী	১৬০
রাত ভোরে	দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৭
বয়স যেখানে বাড়ে না	হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১৭২
অন্য কোনোখানে	সিদ্ধার্থ ঘোষ	১৮৫
পরমেশ্বরনের মাষ্টারি	সুধীন্দ্র সরকার	১৯৪
সংঘর্ষ যদি হয়	অনীশ দেব	২০২
নগেনবাবু খগেনবাবু	কিন্নর রায়	২১২
বৈজ্ঞানিক দেবাংশু সেন	শমীন্দ্র ভৌমিক	২১৯

সংকলন প্রসঙ্গে

'চলন্তিকা'য় লেখা আছে বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ কিনা পরীক্ষা প্রমাণ-যুক্তি-ইত্যাদি দিয়ে নির্ণীত ও শৃঙ্খলিত জ্ঞান। বিজ্ঞানের কোনো একটা তত্ত্বের বা তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষন করে যে সব অভাবনীয় এবং মাঝেমধ্যে পিলে চমকানো নতুন ধারণা মনের সামনে উদয় হয় তাই দিয়েই তৈরি হয় বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য।

এই সাহিত্য দুরকমের। প্রথমটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, ইংরেজিতে 'সায়েন্স ফিকসন'। দ্বিতীয়টি কল্পবিজ্ঞানের গল্প, ইংরেজিতে যার নাম 'সায়েন্স ফ্যানটাসি'।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণ করা তথ্য দিয়ে লেখা। আর কল্পবিজ্ঞানের গল্প বিজ্ঞানের কোনো একটা তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে, যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে কখনও আনন্দদায়ক, কখনও মজা, কখনও রোমাঞ্চকর পরিণামের দিকে তার কল্পনার মায়াজাল বুনে চলে। বৈজ্ঞানিক হয়তো কোনো পরীক্ষায় যা খুঁজে পাননি, কল্পবিজ্ঞানের লেখক সেই পরীক্ষাতেই নানান উপাদান সযত্নে জোড়া দিয়ে, কল্পনার আলো ফেলে নতুন কোনো বিষয় প্রকট করে দেন। তাই ছোট বড় সব পাঠকই সায়েন্স ফ্যানটাসি অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞান গল্পের ভক্ত।

আসলে কল্পবিজ্ঞানের গল্প হল একালের রূপকথা। সেখানে পক্ষিরাজ ঘোড়া চেহারা পাল্টে হয় মহাকাশ-যান। কিংবা সাত সাগর আর তেরো নদীর পারের দেশটা হল ভিনগ্রহ।

অনেক হয়তো বলবেন, কল্পবিজ্ঞানের গল্প উদ্ভট এবং অভাবনীয়। তবে আমরা এই সংকলনে যে গল্পগুলো বেছেছি, সেখানে বৈজ্ঞানিক তথ্য যতটুকু আছে সবটাই নির্ভুল। আর লেখকরা যে সব যুক্তি দিয়ে গল্প গুলো লিখেছেন সেগুলোও নিখুঁৎ।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প এখন কিশোর কিশোরীরা ভালবাসতে শুরু করেছে। সেইজন্যই এই সংকলন। আমরা চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি সংকলনটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি সেরা নিদর্শনগুলো সাজিয়ে দিতে।

হেমলাল দত্তের গল্পটি যতদূর জানা গেছে বাংলায় লেখা প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প। আর বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গল্পটি সেকালের কুন্তলীন সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী।

এবারে কৃতজ্ঞতা জানাই লেখকদের, যাঁরা তাঁদের লেখা গল্প ছাপার অনুমতি দিয়ে এই সংকলনের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আর যেসব লেখকরা ইহলোকে নেই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের। এঁদের সকলের আন্তরিক সহমর্মিতায় প্রকাশিত হল কল্পবিজ্ঞানের গল্প।

প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক আমাদের একান্ত প্রিয়জন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানো বাতুলতা মাত্র। কেননা তার ঐকান্তিক চেষ্টাতেই সফল হল বাংলার কিশোর কিশোরীদের বিজ্ঞানমনস্ক করার ইচ্ছে।

যদি এই সংকলন তাদের সেই ইচ্ছেটাকে নাড়া দেয় তবেই বুঝব আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সুধীন্দ্র সরকার

কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারি ১৯৯৬

রহস্য

হেমলাল দত্ত

সম্পাদক মহাশয়, আপনি "বিজ্ঞানদর্পণ"প্রকাশ করিতেছেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালির মধ্যেপ্রায় কাহারও বিজ্ঞানে আস্থা নাই। অনেকেই বলেন "আমি কেরানি হইয়াছি, চিরকাল কেরানিগিরি করিয়া মরিব। বিজ্ঞান পড়িয়া আমার কী হইবে?" অনর্থক নীরস বিজ্ঞান তত্ত্বে মস্তক বিঘূর্ণিত করিব কেন? এটি তাঁহাদের বিষম ভ্রম! সকল বিষয়ের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।

ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিব এবং বড়লোক হইব, এই আশায় কলেজ ছাড়িয়া আমি বিলাতে গিয়াছিলাম। পাঁচ ছয় মাস লন্ডনে থাকিতে থাকিতে আমার বিস্তর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল। আমিও সাহেবদের সঙ্গে থাকিয়া একরকম সাহেব হইয়া পড়িলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার সাহেব হইবার ইচ্ছা ছিল। কলিকাতায় একবার সাহেব সাজিয়া কয়েকজন বন্ধুকে এরূপ ভয় দেখাইয়াছিলাম যে, সে কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। তাহারা আমাকে সে বেশে চিনিতে পারে নাই। তবু তখন পরচুলের দাড়ি গোঁফ করিয়াছিলাম। এখন আমার বেশ গোঁফ দাড়ি উঠিয়াছে এবং বাঙালি ধরনে দাড়ি না রাখিয়া হুইস্কার রাখিয়াছি। রংটা কিছু কালো, তা প্রত্যহ যেরূপ সোপ ব্যবহার করি তাহাতে এরূপ ভরসা আছে, যে দেশে ফিরিয়া যাইলে নগেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়া কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না।

পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, বিস্তর সাহেবের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হার্বি নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। হার্বিসাহেব খুব ভাল ইঞ্জিনিয়ার ও বড় ভদ্রলোক। হার্বির রাজ্যসরকারের চাকরি, মাসিক বেতন একশত পাউণ্ড। আমাদের পরস্পরে এরূপ ভাব জন্মিল যে বাঙালি ও ইংরাজে তদ্রূপ হইতে পারে না; দুই ইংরাজেই সম্ভব। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন সংবাদ আসিল যে হার্বি সাহেবের খুড়ির কাল হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান হেতু মৃত্যুকালে হার্বির নামে সমস্ত বিষয় উইল করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমার বন্ধুর আনন্দের সীমা থাকিল না। আর চাকরি করিতে হইবে না। টেবিলের উপর পা তুলিয়া চিরকাল বড়মানুষি করিতে পারিবেন, এই আনন্দে বন্ধু উন্মত্ত হইলেন। একেবারে চাকরিতে জবাব দিয়া পরদিনই হার্বি লন্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন, "দেখ নগেন্দ্র, বোধহয় তোমার পরীক্ষা শেষ না হইলে তুমি আমার বাড়ি দেখিতে যাইতে পারিবে না। তার এখনও আট মাস বিলম্ব আছে। যাহা হউক এই সময়ের মধ্যে আমিও একরকম বাড়িটি সাজাইতে পারিব। কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলো, পরীক্ষার শেষে আমার বাড়িতে গিয়া দশ পনর দিন থাকিবে ত?" আমি বলিলাম, "তার আর আপত্তি কী? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার নিত্য এত পরিশ্রম

করা অভ্যাস; এখন ত আর কোনো কাজই রহিল না। কিরূপে দিন কাটাইবে?" উত্তর—"কেন কাজের ভাবনা কী? পরের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে না বলিয়া কি আর কাজ নাই? আমি এখন হইতে নিজের বাড়িতে বৈজ্ঞানিক কলবল প্রস্তুত করিব, যাও তো দেখিতে পাইবে। আর ভাই বসিতে পারি না, শীঘ্রই ট্রেন ছাড়িবে।"

এই বলিয়া হার্বি সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন।

এক মাস, দুই মাস করিয়া ক্রমে জলের মতো আট মাস কাটিয়া গেল। পরীক্ষার সময় আসিল, ক্রমে তাহাও শেষ হইল। এই কয় মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে হার্বির পত্র পাইতাম। প্রতি পত্রে তাহার সহিত দেখা করিবার অনুরোধ আসিত। প্রতিপ্রত্যুত্তরে যথা সময়ে অনুরোধ রক্ষা করিবার মানস জানাইতাম। শেষ পত্রে হার্বি লিখিল, "সোমবার বৈকালে চারটার ট্রেনে এখানে আসিবে, আমি গাড়ি লইয়া স্টেশনে অপেক্ষা করিব। এখানে তোমাকে পনের দিন থাকিতে হইবে, ইহার কমে ছাড়িয়া দিব না।"

সোমবার বৈকালে একটি পোর্টমেন্টো গুছাইয়া গাড়িতে উঠিলাম। হার্বির বাড়ি যাইতে যে স্টেশনে নামিতে হয়, তাহা লন্ডন হইতে প্রায় পনের ক্রোশ দূরে। যথা সময়ে সেই স্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। হার্বি সেইখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া বিস্তর আহ্লাদ প্রকাশ করিল। দুইজনে তাহার গাড়িতে চড়িয়া চলিলাম।

কিছুদূর হইতে নিজের বাড়ি দেখিতে পাইয়া হার্বি বলিল, "ঐ আমার বাড়ি দেখা যাইতেছে, ঐ যে বাগানের চতুর্দিকের বাড়িগুলি দেখিতেছ এসব আমার বন্ধুদের বাড়ি। আমার বাড়ি হইতে সকলকার বাড়িতে টেলিগ্রাফের তার বসাইয়াছি। যে দিন আমার কোনো বিশেষ কাজ থাকে না, একজনকে টেলিগ্রাফ করি, আমার সহিত দাবা খেলিবে তো শীঘ্র আইস—না হয় তো' অপরকে বলি—সময় থাকে তো চল শিকার করিতে যাই।"

কথা কহিতে কহিতে ফটকের কাছে আসিয়া পঁহুছিলাম। হার্বি গাড়ি থামাইল। ফটক বন্ধ ছিল কিন্তু খুলিবার জন্য গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করাতে, হার্বি আমাকে স্থির হইয়া বসিতে বলিল।

ফটক আপনি খুলিয়া গেল। আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "বাঃ! ভারি মজাতো! গেট আপনি খুলিয়া যায়।"

হাসিয়া হার্বি বলিল, "কেন? বুঝিতে পারিলে না? গেটের দশ হাত এদিকে রাস্তায় একখানি লোহার পাত আছে, গাড়ি তাহার উপরে আসিতেই সেটা একটু নামিয়া গেল। এই লোহার পাতের আর ফটকের আংটার সঙ্গে মাটির নিচে দিয়া একটি লোহার শিক আছে। লোহার পাত নামিয়া যাওয়াতে ঐ শিক ফটকের আংটাকে ছাড়িয়া দিল। ফটকে স্প্রিং আছে, উহা আপনি খুলিয়া গেল। ভিতর দিকে ঠিক এই রকম আর একটা লোহার পাত আছে। তাহার উপর দিয়া যখন গাড়ি যাইবে, ঠিক এইরূপে ফটক আপনি বন্ধ হইবে।"

আমি। এইরূপ কলের ফটক কই আর কোথাও দেখি নাই। ইহাতে তোমার ভারি সুবিধা হইয়াছে।

হার্বি। সুবিধা নয়! আমাকে দরওয়ান রাখিতে হয় না।

গাড়িবারান্দায় নিচে গাড়ি আসিল। দেখি, একজন সহিস দাঁড়াইয়া আছে; একজন চাকর ভিতরের দরজা খুলিতেছে। আমি কিছু না বলিবার পূর্বেই হার্বি বলিল, "দেখ, আমি কাহাকেও ডাকি নাই, তথাপি আমরা আসিয়াছি ইহারা জানিতে পারিয়াছে। ফটক খুলিবার লোহার পাত দেখিয়াছ, সেই পাতের সঙ্গে দুটি ইলেক্‌ট্রিক্ তার আছে। আস্তাবলের ও চারকদের ঘরের ঘণ্টার সহিত ঐ তারের যোগ আছে। লোহার পাতটি নামিয়া যাওয়াতে ঐ তারের দ্বারা দুটি ঘণ্টা বাজিয়াছে। ঘণ্টার শব্দে ইহারা জানিতে পারিল যে, কেহ বাড়িতে আসিতেছে।"

আমি। এটাও বড় মন্দ নয়। কোনো ভদ্রলোককে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না।

বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম। হার্বির ভগিনী পাশের ঘরে বসিয়া ছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, হার্বি পরস্পরের পরিচয় দিয়া দিল। মিস্ হার্বিকে দেখিয়া, হার্বির ভগিনী বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার

বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। তিনি যথাসাধ্য মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়, আসিতে কোনো কষ্ট হয় নাই তো'?" এইরূপ আরও দুই একটি কথার পর তাঁহার কোনো গৃহকার্য মনে পড়াতে চলিয়া গেলেন।

উঠিবার সিঁড়ির বাম দিকে দেখিলাম, একটা মোটা লোহার শিকের গায়ে কতকগুলি বাঁকান লোহার কাঠি আছে। এক একটি কাঠিতে এক একখানি ব্রুস লাগান আছে। কলটি দেখিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম "হার্বি, ওটা কী হে।"

হার্বি। কোন্‌টা! ওঃ। ওটি আমার ব্রুসের কল। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই যে জমি হইতে এক ফুট উঁচুতে একখানি চৌকি দেখিতেছ উহার উপর উঠিলেই তোমার ভারে আস্তে আস্তে চৌকিখানি নামিতে থাকে। আর নামিবার সময় তাহার মধ্যস্থিত কতকগুলি ঘড়ির কলের মতন চাকাকে চালাইয়া দেয়, আর এই সকল বাঁকান ব্রুস-লাগান শিকগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার কোট পেণ্টুলেন ও জুতা ব্রুস করিতে থাকে। কিন্তু সকল অপেক্ষা উপরের হ্যাট ব্রুসটিই মজার। এটি দেখিতে ঠিক যেন একটি হ্যাট বাক্স দুই ভাগ করা। এখন ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ—

আমি। চমৎকার! চমৎকার! একবার ওঠ না দেখি কেমন চলে।